ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)

‘ধর্মনিরপেক্ষতা’(Secularism) কথাটির একটি যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ এই বিষয়ে সমাজবিদ্‌গণ একমত হতে পারেন নি। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ঠিক কি বোঝায় তার ধারণাও স্পষ্ট নয়। সাধারণতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সংবিধানের কোথাও সেরকমভাবে তার অর্থ পরিষ্কার করে বলা হয় নি। ফলে এই শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নানারকমের বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার মূলে পশ্চিমী চিন্তা ও চেতনার প্রভাব বর্তমান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে তাই নিয়ে পোপ ও রাজার মধ্যে বা বলা যায় চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলছিল। অবশেষে জাগতিক সকল বিষয়ে রাজা বা রাষ্ট্রের কায়েম প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই সময় থেকে রাষ্ট্র ও গীর্জার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা যুক্ত হয়। বলা হয় যে রাষ্ট্র পার্থিব বিষয়াদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই রাষ্ট্র ধর্মীয় নীতি-নির্দেশের অধীন নয়। অর্থাৎ ধর্মের এলাকা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রের এলাকাকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা হয়। ফলে পশ্চিমী দুনিয়ায় দীর্ঘ তিন দশকের অধিককাল ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। বিশ্বজনীন মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার মূল নিহিত। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার অভিব্যক্তি ঘটে মূলত ধর্মের সাথে সম্পর্ক রহিত চিন্তাধারা ও কাজকর্মের মাধ্যমে।

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত এই পশ্চিমী ধারণা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল 'ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতা' (absence of connection with religion)। এদিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় সাধারণ জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা। এই প্রসঙ্গে লিও ফিফার (Leo Pfeffer) বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হল রাষ্ট্র থেকে গীর্জাকে আলাদা রাখা। কিন্তু ভারতে এরকম সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করা হয় নি।

বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ বরাবরই একটি ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র। কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, ভারত রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী বা এদেশে ধর্মের কোন স্থান নেই। কে. এম্. পান্নিকর (K. M. Panikkar) এই প্রসঙ্গে তাঁর ঝবন ঊষয়শধতঢ়ভষশ ষপ গনং ঐশধভত গ্রন্থে বলেন, 'The Indian State by becoming secular has not become irreligious. Its secularism is negative in the sense of not permitting religious considerations to entre into the principle of state action'। এইচ্. ভি. কামাদ্ (H. V. Kamath) -এর মতে 'ধর্মনিরপেক্ষত রাষ্ট্র বলতে দেবতাহীন রাষ্ট্র বা ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রকে বোঝায় না।

তিনি বলেন, ‘To my mind, a secular state is neither a goldless state nor an irreligious state nor an antireligious state’। ড. সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান তাঁর Recovery of Faith গ্রন্থে বলেন যে, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র বলতে অধার্মিক, ধর্মবিরোধী, বা ধর্মে ব্যাপারে উদাসীন রাষ্ট্রকে বোঝায় না।। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর বক্তব্য হল, ‘We call our state a ‘secular` perhaps is not a happy one. And yet for want a better word we have used it’।

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রধান পৃষ্ঠপোষদের অন্যতম মহাত্মাগান্ধীর এই প্রসঙ্গে বক্তব্যের উল্লেখ করতে গিয়ে রুড্লফ (Lioyd I. Rudolph) তাঁর Cultural Policy of India গ্রন্থে বলেন, মহাত্মা গান্ধীর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার মূল কথা হল, ধর্মীয় জনসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে পারস্পরিক অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার সত্যের জন্য শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানবিকতাবাদের আদর্শের কথাই বেশী করে লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, "In the secular satae of India, every religion and belief has full freedom and equal honour, and every citizen has equal liberty and equal opportunity. The minorities are given fair and just treatment and equitable educational and economic facilities. There is freedom of conscience even for those who have no religion …. Free play for all religious subject only to not interfering with each other or with the basic conception of our state'।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ভারতে যেভাবে দেখা হয় তা হল, ভারত ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। এখানে কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। বলা হয় যে, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ হল মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তার নিজ নিজ বিবেক ও বিশ্বাস অনুসারে, তাদের স্বতন্ত্র অন্তরের আকুতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচরণ করে।

ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্যের নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের দিক থেকে কোন বিশেষ আচরণ কাম্য নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম প্রত্যয় হল ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। আর এই কারণে বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অপরিহার্য ও প্রগতিশীল নীতি হিসাবে স্বীকৃত।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বোঝায় না। বলা হয় যে রাষ্ট্র যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও ধর্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। এপ্রসঙ্গে ভেঙ্কটরমন বলেন, ভারতে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। রাষ্ট্র যে-কোন ধর্মের সংস্রব এড়িয়ে চলবে। কোন ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করবে এবং মানুষকে ধর্মীয় বিবেচনা ছাড়াই কেবল মানুষ হিসাবে গণ্য করবে। স্মিথ (D. E. Smith) বলেছেন, 'The secular state is a state which guarantees individual and corporate freedom of religion, deals with the individual as a citizen irrespective of this religion'।

রাষ্ট্রের কাজকর্ম মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে, মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাস সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। ধর্মবিশ্বাস মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলবে। আম্বেদকর (Ambedkar)-এর মতানুযায়ী, ধর্মনিরপেক্ষতার মূল অর্থ রাষ্ট্র জনগণের ওপর কোন ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেবে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকলকে সমানভাবে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা দিতে হবে।

অধ্যাপক জোহরী (J.C. Jihari) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। এগুলি হল ঃ ১) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত উদার(Liberal)। ধর্ম-বিষয়ে সকলের সমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সংখ্যালঘু ধর্ম সম্প্রদায়গুলির জন্য কিছু বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। শিখদের 'কৃপাণ ধারনের' এবং খ্রীষ্টানদের 'ধর্মপ্রচার'-এর অধিকার দেওয়া হয়েছে। হিন্দুরা এখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় আশি শতাংশ। কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেই কেবল সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে। ২) ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা বিশেষভাবে গতিশীল (Dynamic)। রাষ্ট্র জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় বিধীরীতি লঙ্ঘন করেও আইন তৈরী করতে পারে।

৩) ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি নিয়ন্ত্রিত (Qualified)। অনিয়ন্ত্রিত নয়। কারণ কখনই ব্যক্তিগত আইন (Personal law) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে থাকতে পারে না। রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, সদাচার ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।
৪) ভারতের রাজনীতিকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু জনগণের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে ধর্মে ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism in India)

পশ্চিমী চিন্তা-চেতনার আলোকে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটিকে ব্যবহার করা হয় নি। ব্যাপক অর্থে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি অর্থ গ্রহণ করে ভারতের সংবিধান রচনাকালে রচনাকারদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। সংবিধান রচয়িতাদের অন্যতম সদস্য অনন্তশায়ানাম আয়েঙ্গার (Ananthsayanam Ayyangar) বলেন, "We are pledged to make the state a secular one'। জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) এই প্রসঙ্গে বলেন, 'The guarantee of fundamental right relating to religion constitutes the sheet-anchor of our secular state'।

ভারতীয় সংবিধানে ২৫ থেকে ২৮ এই চারটি ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৫ নং ধারা অনুসারে ভারতের সকল ব্যক্তি সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ এবং ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে। ব্যক্তি তার বিবেক অনুসারে ধর্মমত অবলম্বন করার অধিকার ছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করার এবং ধর্মীয় মতামত প্রচার করার অধিকারও ভোগ করবে। রাষ্ট্র সাধারণত কোন ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু কোন বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অঙ্গ কিনা আদালত তা নির্ধারণ করতে পারবে।(হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য মামলায় [১৯৫৮] সুপ্রিম কোর্টের রায়)।

তবে এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়। জনশৃঙ্খলা, সদাচার, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। তাছাড়া ধর্মাচরণের সঙ্গে জড়িত যে-কোন অর্থনৈতিক(economic), বৈত্তিক(financial), রাজনৈতিক), বা ধর্মনিরপেক্ষতা (secular) সম্পর্কিত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে [২৫ (২) (ক) ধারা]। আবার সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক সংস্কারসাধন বা জনপ্রতিনিধিমূলক হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণীর হিন্দুদের প্রবেশাধিকারের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রনয়ন করতে পারে। [২৫ (২) (খ) ধারা]।

‘হিন্দু’ বলতে শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বীদেরও বোঝাবে। শিখ ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে শিখগণ কৃপাণ ধারণ ও বহন করতে পারবে। সম্প্রতি এ বিষয়ে শিখদের অকালী গোষ্ঠী ভিন্ন দাবী ঘোষণা করেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থাকে অযৌক্তিক বলা যায় না। কারণ কোন ব্যক্তি ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে না। তেমনি আবার ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে সতীদাহ, দেবদাসী প্রভৃতি কু-প্রথাকে মেনে নেওয়া যায় না। রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও কয়েকটি অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৬ নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (ক) ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে; (খ) ধর্মীয় বিষয়ে নিজ নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারবে; (গ) স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে ও মালিক হতে পারবে এবং (ঘ) আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে রাষ্ট্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উক্ত অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কোন ধর্মসম্প্রদায়ের 'তত্ত্বাবধানের' অধিকারের অজুহাতে কোন সভ্যকে একঘরে বা ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করতে পারবে না [তাহের বনাম তাহে ভাই মামলা (১৯৫৩)]।

কিন্তু বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না (২৭ নং ধারা)। ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে এই জাতীয় কর আরোপ নিষিদ্ধ হয়েছে। তা ছাড়া ২৭ নং ধারার আর একটি উদ্দেশ্য হল এক ধর্মসম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে অন্য সম্প্রদায়কে রক্ষা করা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮ নং ধারায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ম-নিষেধের উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১) সম্পূর্ণভাবে সরকারী অর্থে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম-শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষাদান একেবারে নিষিদ্ধ। ২) কিন্তু সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা সরকারী অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান একেবারে নিষিদ্ধ করা হয় নি। তবে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতি প্রয়োজন। ৩) সম্পূর্ণ বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান সম্পর্কে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় নি। কোন দাতা বা অছি কর্তৃক ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হলেও সেখানে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে।

২৫ থেকে ২৮ নং ধারা ছাড়াও সংবিধানের অন্যান্য অংশেও ধর্মীয় অধিকারের উল্লেখ আছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় চিন্তা, বাক্য, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা বলা আছে। ১৪ নং ধারায় আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৫ ও ১৬ নং ধারায় কেবল ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেণীভাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতাকে অবলুপ্ত করা হয়েছে।সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৯(২) নং ধারায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে এবং ৩২৫ নং ধারায় ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সংবিধানে বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকতা প্রদানের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় বিচার-বিবেচনাকে সংবিধানে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। আবার গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগের প্রাক্কালে শপথ নেওয়ার ব্যাপারে আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে বৈষম্য করা হয় নি। এ বিষয়ে সংবিধানের তৃতীয় তপশীলে বিস্তারিত বলা আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ ভগবানের নামে শপথ নিতে পারেন। বিপরীতক্রমে যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, তাঁরা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে পারেন।

ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়। জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নৈতিকতা বা সদাচারের স্বার্থে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এবং এ ক্ষেত্রে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্যান্য বিধি-নিষেধও প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ ধর্মে সাথে জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য ও সদাচারের সংঘাত দেখা দিলে বা তৃতীয় অধ্যায়ের অন্য কোন বিধি-নিষেধের বিরোধ দেখা দিলে ধর্মকেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। ধর্ম শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করতে পারে না বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। সংবিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুণ্যভূমি ভারতে সকল ধর্মই সমান। বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকার ও কার্যকর করা হয়েছে। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। ভারতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে যে-কোন রাজনৈতিক পদে নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্যের নজির হিসাবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তিনবার ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বচনের কথা উল্লেখ করা হয়। ড. জাকির হোসেন, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ও ড. আব্দুল কালাম আজাদ ভারতের সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রনৈতিক পদ অলঙ্কৃত করেছেন। আবার মহম্মদ হিদায়েতুল্লা উপরাষ্ট্রপতি পদ অলঙ্কৃত করেছেন। এরা চারজনই কিন্তু ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। তেমনি জ্ঞানী জৈল সিং এবং মনমোহন সিং সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায় থেকে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও প্রাধানমন্ত্রী হয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার এমন সাফল্যের নজির পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রে আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তাই বলা যায় ভারত হল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে ধর্মের নামে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ কারুর প্রতি করা হয় না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ